Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.40-56
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ: আধুনিকতা ও বাস্তবতার অনন্য মেলবন্ধন

ড. সুশান্ত ঘোষ
অধ্যাপক, সরকারি মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Troilokyanath Mukhopadhyaya was an eminent writer in Bengali literature at ninetieth century. He was composed many Short-stories and Novel in Bengali. He is the creator of eccentric humor in Bengali literature. But this is not his only identity. He also gained fame as an essayist. Essays were written for the common citizens for the betterment of the country. In the article, he resolved to make the country self-reliant. Biral, Erond ba reri, Gas, Louho are most popular work. In this short discussion I will assess his achievements as an essayist.

Keywords: Humor, Scientific contents, Conflict and, Development, Realistic approach, modern concept

(প্রথম পর্ব)

বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য পরিচয় উদ্ভট 'হাস্যরসাত্মক গল্পের জীবনশিল্পী' হলেও এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সব্যসাচী এবং বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম তা তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকৃতির উপক্রমণিকা পাঠ করলেই বোঝা যায়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল উদ্ভট হাস্যরসিক এই মানুষটি আপাত সরল কৌতুকময় হাস্যরসের অন্তরালে তাঁর মানসজগতে যে এক অতিসক্রিয় দেশপ্রেম-চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার উর্বর কর্ষিত ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন তা রীতিমতো বিস্ময়ের। যে সময় ভারতের দেশীয় বিজ্ঞানভাবনা এবং শিল্পোদ্যোগ একেবারেই সদ্যভুমিষ্ঠ অথবা নেই বললেই চলে, সেই সময় ত্রৈলোক্যনাথ শিল্পের চাহিদা অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষের মাটিতে। একদিকে নির্ভেজাল বাস্তবতা আর গবেষকের সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা'কে মস্তিষ্কে ধারণ অন্যদিকে হৃদয়ে মমতাপূর্ণ দেশপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতিকে একীভূত করে অনিন্দ্যসুন্দর সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক অসাধারণ কোলাজ তৈরি করেছেন তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে। কর্মসূত্রে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরেছেন। দেখেছেন দরিদ্র অভুক্ত অসহায় ভারতবাসীদের ক্লীন্নতা। তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি স্বদেশের উন্নতির নীরত চেষ্টা করতেন। ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী হলেও দেশপ্রেম ছিল তার হৃদয়ে। হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন প্রকৃতির জ্ঞানে ঋদ্ধ। তাঁর অন্বেষণ ছিল প্রজ্ঞা আর সত্যের মেলবন্ধন।

ঊনবিংশ শতকের অপরাহ্ন বেলায় যখন নবজাগরণের ঢেউ একবারে তীরে এসে মিলিয়ে যায়নি বরং সাহিত্য শিল্পের আবিষ্কার ও সংস্কার তখনও উদ্দীপ্ত প্রভায় চলেছে, সেইসময় বিদ্যাসাগর মহোদয় থেকে

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কিংবা জগদীশ চন্দ্র বসু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সংস্কার ও পরিমার্জনের সাথে সাথে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার এক উন্মুক্ত সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ সেই যুগের এই উদ্দাম স্রোতকে উপেক্ষা করতে পারেননি। সরকারি কর্মচারী হয়েও তিনি দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন এবং দেশীয় বিনিয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের উন্নতি করতে গেলে কেবল পুস্তকাদি অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং উপযুক্ত দেশীয় শিলস্থাপন, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান সাধনা এবং সমসাময়িক কালের চাহিদা ও আবেদন স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে। শিল্পের ব্যাপক ও অর্থবহ উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষের পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কিভাবে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন করা যায়। স্বদেশীদের মতো তিনি বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অধিক মূল্যে দেশীয় দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে সায় দেননি। কারন তিনি জানতেন এই বৃহৎ ভারতবর্ষের সংখ্যাধিক্য নাগরিকই অত্যন্ত গরীব এবং কাঞ্চন মূল্যে কোনওভাবেই তাদের পক্ষে দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব নয়। তিনি অন্ধ আবেগঋদ্ধ দেশপ্রীতির চেয়েও দেশের নাগরিকদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তিনি সবসময় সমকালীন সময়ের দাবীকে মেনে নিতে পরামর্শ দিতেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে যদি মেনে নিতে না পারা যায় তাহলে দেশের উন্নতি অধরাই থেকে যাবে একথা তিনি অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে দৃঢ়চিত্তে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিকতা ছিল তাঁর মজ্জায়। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌবরকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন আধুনিকতার দৃষ্টিতে। বারবার তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন ভারতবর্ষ অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ বিশ্বের সকল দেশের চেয়ে উন্নত; কিন্তু সেই সম্পদ কাজে লাগাতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহন করতে হবে। দেশের শিল্পপতিদের এগিয়ে এসে শিল্প স্থাপনে সহায়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করে তা উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। তাঁর এই চিন্তা যুগের চেয়েও অগ্রবর্তী ছিল। সেই কারনেই তাঁর হাস্যরসিক আপাত উদ্ভট হাল্কা মেজাজের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় এক অনন্য গভীরতা যা তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে অতি সহজেই চিনিয়ে দেয়। এরূপ একই দেহে বিপরীত মেরুর অবস্থান বেশ বিরল। হাস্যরসাত্মক হাল্কা মেজাজের গল্প লিখলেও তিনি মোটেও বাস্তব বিচ্যুত ছিলেন না, বরং সিরিয়াস জ্ঞানের সাধনাতেও অসাধারণ পারজ্ঞমতা অর্জন করেছিলেন। বিপরীত মেরুর দুই মেধাকে একই সাথে সমান্তরাল পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার অমিত ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'মজার গল্প' কিংবা 'ডমরু চরিত' গল্পগন্থ গুলির সাথে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর প্রবন্ধগুলি গল্পাকারের মানসিকতা দিয়ে রচিত হয়নি। গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্প যেখানে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য উন্মুক্ত সেখানে প্রতিটি প্রবন্ধ বস্তুগত এবং সিরিয়াস বিষয় বিন্যাসে বিন্যস্ত। যদিও সদা হাস্যরসিক এই মানুষটি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন পাঠককে হাস্যরসের উপহার দিয়ে আনন্দিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। যা তাঁর প্রবন্ধের ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের বিষয়কে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কিংবা জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রাবন্ধিক সত্ত্বার সঙ্গে অবশ্য কোনও মিল নেই। রামেন্দ্রসুন্দর কিংবা জগদীশ চন্দ্র দুজনেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং বিজ্ঞানী; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন অল্প শিক্ষিত।কিন্তু বিজ্ঞানীসুলভ মানসিকতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা ভৌতবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লিখিত।সেইসব প্রবন্ধে তাঁর বিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভিঙ্গি বাস্তবের দৃষ্টিকোন থেকে নিখুঁত বিশ্লেষণ সত্যিই আশ্চর্যের। ইতিহাস, পুরান, ভূগোল,

বিজ্ঞান তিনি একসাথে মিলিয়ে দিতে পারতেন। ঐতিহ্য পরম্পরাকে বাতিল না করেও যে আধুনিক বিজ্ঞানকে সচেতন মানসে গ্রহন করা সম্ভব তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধ গুলিতে। কর্ম সূত্রে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেছেন। এমনকি গবেষনার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিলেতেও পাঠিয়েছিলেন। তার প্রবন্ধগুলি এই গবেষকধর্মী মনন ও চিন্তন দ্বারা ঋদ্ধ।

ভারতের উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সরকারকেও প্রীত করেছিল। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষি চাষে ভিন্নতা এনে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল এবং অনেকাংশে দুর্ভিক্ষ রদ করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং চিন্তাবিদ। দেশের উন্নতিতে তিনি সদা তৎপর ছিলেন। দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে দেশের মাটিতে উৎপাদনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। কেননা তিনি মনে করতেন ভারতের উন্নতি কেবল স্বনির্ভরতা থেকেই সম্ভব। প্রাচীনপন্থীদের তিনি মেনে নিতে পারেননি। বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে তিনি ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে অচ্ছ্যুত করে দূরে সরিয়ে না রেখে তাকে গ্রহন করতে বলেছিলেন। কেননা কৃতবিদ্য এই মানুষটি জানতেন বিজ্ঞান সাধনা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতিরিকে ভারতের ভাগ্য বদলানো অসম্ভব। তাঁর এই সংস্কারবাদী চেতনা এ যুগেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রবন্ধে বিশাল আয়োজনের বিপুল ব্যপ্তি হয়তো নেই, কিন্তু সহজ সরল জনপাঠ্য ভাষায় লেখা হাসিখুশি- লঘু মেজাজে পরিপূর্ণ প্রবন্ধগুলি এক অনবদ্য গাম্ভীর্য, চিন্তা-চেতনা ও বিজ্ঞান মনস্কতায় ঋদ্ধ।

তাঁর 'ভারতে সুবর্ণ' নামক প্রবন্ধে এক অতি প্রয়োজনীয় তথা সমসাময়িক বিষয়কে যুক্তি তর্কের মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করেছেন,যা প্রবন্ধটির শিরোনামেই প্রকাশিত। একশ্রেনির স্বর্ণ লোলুপ ব্যক্তিরা অতি ধনী হবার তীব্র অভিলাষে সত্যমিথ্যা যাচাই না করে সুবর্ণময় ভূখণ্ড ক্রয়ের জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল। অগ্রপশ্চাদ বিবেচনাহীন এই সব ব্যক্তিদের অবিমৃশ্যকারীতা তিনি তুলে ধরেছেন।একশ্রেনির মানুষের ঠগ মানসিকতাকে তিনি দেখিয়েছেন যারা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্বলতাকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে।প্রাবন্ধিক অতীত সভ্যতা ও মহাকাব্য থেকে নির্যাস বের করে এনে দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই সুবর্ণ পাওয়া যেত এবং এখনো উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের মাটি থেকেই কম খরচে সুবর্ণ উত্তোলন করা সম্ভব। যা দিয়ে দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও তা বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ কেবল তাঁর কথার কথানয়।তিনি উপযুক্ত প্রমান সহকারে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের সমাবেশে প্রমান করেছেন ভারতের সুবর্ণ কম খরচে উত্তোলন করা সম্ভব। যে সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে সেই সময় বহুভারতীয় মনীষীই বিদেশী দ্রব্য বা প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে দেশবাসীকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অতি সচেতন প্রাবন্ধিক মনে করতেন এ সবই ভুল সিদ্ধান্ত এবং এই সংকীর্ণতার জন্য ভারতের উন্নয়ন থমকে যাবে এবং দেশের মানুষেরা তীব্র দারিদ্রের সম্মুখীন হবে।তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান কারও নিজস্ব সম্পদ হতে পারে না।বিজ্ঞানের আশীর্বাদ বিশ্ববাসীর সবার জন্যই। সুতরাং সামান্য কারনে বিদেশ থেকে আনা বিজ্ঞানকে বর্জন করলে তা হবে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি জানতেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাকে স্বাগত জানালে কিছু প্রাচীন জীবিকা অপ্রচলিত হয়ে যেতে পারে, মানুষ কর্মহীন হয়ে যেতে পারে কিন্তু তবুও কোনওভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে প্রাচীনতাকে অবলম্বন করে দেশকে পিছনে ফেলে দিতে রাজী ছিলেন না। এইওকারনেই যখন বর্ধমান থেকে হাওড়া রেল ইঞ্জিন পরিবহণ ব্যবস্থায় যোগ হয় তখন হুগলী নদীর মাঝিরা তা আটকানোর চেষ্টাক তিনি সমর্থন করেননি।কারন তিনি মনে করতেন আধুনিক যুগ গতির যুগ, সাধারন দরিদ্র মানুষ যাতে কম খরচে শহরে যেতে পারে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার জন্য এই রেল পরিষেবা নিতান্তই দরকার। যারা শৌখিন তারা

কি করবেন সেটা তার ব্যাপার হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার উন্নতি ও সুবিধা আগে দেখা দরকার বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর কাছে দেশের উন্নয়ন সবার আগে ছিল। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে কতখানি আধুনিক মানসিকতার ধারণা পোষণ করতেন তা এখান থেকেই স্পষ্ট হয়। তিনি জানতেন সুবর্ণের উত্তোলন দেশীয় পদ্ধতিতে দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রয়োজনের তুলনায় এর উত্তোলন অনেক কম হবে দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে।তাই তিনি মনে করতেন যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা কমখরচে দেশের অমিত স্বর্ণ উত্তোলন করতে পারবেন তাঁদের উচিত বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে দেশের মাটিতে এনে তা যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো। এরফলে যেমন পরনির্ভরশীলতা কমবে তেমনি প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করা সম্ভব হবে। দেশের নাগরিকগন কম খরচেই তার প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবে। এভাবেই তিনি দেশকে স্বনির্ভর করে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শেয়ার বাজার সম্পর্কে যখন প্রায় বেশিরভাগ ভারতীয় অজ্ঞ ছিলেন সেই সময় তিনি শেয়ার বাজার সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শেয়ার বাজার সম্পর্কে তার ধারনার সম্যক পরিচয় এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়েছেন। একজন হাস্যরসিক আপাত সঙ্গতিহীন উদ্ভট কল্পনার গল্পাকার যে এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং যে জ্ঞানের ভিত্তি ছিল চরম বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তা তাঁর মানসিকতার বহুতলিক রূপ প্রকাশ করে। তাঁর জ্ঞান, মেধা, মনন ও চিন্তন এক সুদূরপ্রসারী আধুনিকতার দ্যোতনা দানে সক্ষম হয়েছে।হাস্যরসিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা যেমন গগনচুম্বী তেমনি প্রাবন্ধিক হিসাবে তার সিদ্ধি তর্কাতীত এবং বিস্ময়কর। তাঁর লেখা অপর একটি প্রবন্ধ হল "লৌহ"।এই প্রবন্ধটিতে লৌহের ব্যবহার গুনাগুণের পাশাপাশি লৌহের উপাদান, উৎপত্তি প্রাপ্তিস্থান ব্যবসায়ে লৌহের লাভ লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। সুদীর্ঘ এই প্রবন্ধটিতে ব্যক্তিগত অভিমতের পাশাপাশি প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ভূগোলের নানা তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যে ধাতুর ব্যবহার মানব সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি সেই ধাতু উত্তোলন যে ভারতেও সম্ভব এবং কমখরচে তা ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায় তা তিনি অত্যন্ত নিপুন গাণিতিক হিসেব নিকেষের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন একজন অভিজ্ঞ ভূবিজ্ঞানীর মতো। পরিসংখ্যান থেকে ভূগোল সব বিষয়েই তাঁর যে পোক্ত জ্ঞান ছিল তা এই প্রবন্ধটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। যখন ভারতীয় স্কুল কলেজে পড়ানোর মতো এইসব বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যবই ছিলনা সেই সময় কেবল নিজ চেষ্টায় এবং পারঙ্গমতায় বিলেতে থাকাকালীন এইসব বিষয়ে বিপুল জ্ঞানার্জন করেছিলেন।একদিকে দেশীয় মহাকাব্য ও বিভিন্ন পুস্তক অন্যদিকে বিদেশের বিপুল আধুনিক জ্ঞান চর্চা সম্মিলিত ভাবে তাঁর দৃঢ় মনন ও চিন্তনকে বিস্তার ও বিকাশে সাহায্য করেছিল। একদিকে ঐতিহ্য ও পরম্পরা অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের চেতনা ও চলমানতা এই দুয়ের অপূর্ব সহাবস্থান ও সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় এই প্রবন্ধটিতে। রামায়ন মহাভারত পুরাণ থেকেও তিনি যেমন উপাদান গ্রহন করেছেন তেমনি সেগুলিকে বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন অবলীলায়। যা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দিকটিই আলোকিত করে। বিভিন্ন প্রকারের ধাতু ও উপধাতুর নাম ও কিভাবে তা উৎপাদিত হয় তা কিভাবেই বা তা ব্যবহারযোগ্য করা যায় তার একেবারে পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় বর্ণনা দিয়েছেন। দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি কখনও ছোটনাগপুর অঞ্চল কখনও সেই অঞ্চলে বসবাসকারী লৌহ কর্মী আগরী দের ইতিহাস বৃতান্ত তথা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কেবল প্রাবন্ধিক সত্ত্বার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন তা নয়, তিনি প্রাবন্ধিক সত্ত্বার পাশাপাশি একজন প্রকৃত শিক্ষক। তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল, সেকথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। যে গভীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানের

পরাকাষ্ঠা রচনা করেছেন তা অনেক সময়ই বিরল ও ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। মুখ্যত: তিনি বিজ্ঞান্ সাধক ছিলেন না এমনকি নিজেকে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো বিজ্ঞান সাধনায় উৎসর্গ করেননি,দারিদ্রে পূর্ণ জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অল্পশিক্ষিত হয়েও সরকারি চাকুরি করতে বাধ্য হয়েছেন। অতি ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর এই অর্জিত গভীর বিজ্ঞান জ্ঞান বিস্ময় জাগায়। একদম নিপুন ভাবে ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদার্থের ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদান তাদের পরিমান বিক্রিয়াকরন পর্যন্ত একজন বিদগ্ধ বিজ্ঞান সাধকের ন্যায় তুলে ধরেছেন।প্রস্তর খণ্ড থেকে লৌহ নিষ্কাশনের পদ্ধতির তুলনা করেছেন। দেশীয় পদ্ধতিতে যেভাবে লৌহ নিষ্কাশন করা হয় তা অত্যন্ত্য ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ।যন্ত্রের অভাবে ছোটনাগপুর থেকে রাঁচি সর্বত্রই কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা লৌহ নিষ্কাশন করা হয় যা দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রাবন্ধিক আধুনিক বিদেশী যন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলেছেন।আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে তার সাহায্যে লৌহ উত্তোলন করলে তা হবে অনেক সাশ্রয়ী। কেবল পুরানো পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকলে তা দেশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে না। তিনি বুঝেছিলেন পরাধীন ভারতে শিল্পদ্যোগ বলতে কিছুই ছিলনা অথচ আধুনিক ইউরোপের দ্রুত উন্নতি হয়েছে একমাত্র এই শিল্পের বিকাশ ও বিস্তারের ফলে। ভারতবাসীদের স্বদেশ চেতনা প্রবল হলেও স্বনির্ভরতার কথা তেমন করে ভাবেননি কেউই। ফলে যে কোনও দ্রব্যের জন্য পশ্চিমা দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। আবার প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করে স্বনির্ভর হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন দেশের সম্পদ দেশের মধ্যেই প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার যোগ্য করা এতে দ্রব্যের দামও অনেক কম হবে। খাদ্যে স্বনির্ভরতা না থাকার কারনে একসময় উত্তরপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ব্যপক দুর্ভিক্ষ দেখা যায় সেসময় ব্রিটিশ রাজ প্রাবন্ধিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য। সেসময় দেখেছিলেন মূলত খাদ্যের স্বনির্ভরতা না থাকার কারনে ও প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন করার কারনেই খ্যাদ্যের অভাব হয়ে যায়। তিনি আধুনিক প্রদ্ধতিতে গাজর ও গম চাষের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন করে সেই দুর্ভিক্ষ সামলে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই বুঝেছিলেন কি কৃষি, কি শিল্প সব ক্ষেত্রেই প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহন করতে হবে তবেই ভারতের পরনির্ভরশীলতা কমবে ও দেশের ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হবে। বর্তমানে ভারত সরকার যেমন স্বনির্ভর ভারতের জন্য উদগ্রীব তেমনি প্রায় একশ বছরেরও বেশী সময় আগে প্রাবন্ধিক সেই তাগিদ অনুভব করেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে বসে। তাঁর এই চিন্তন যে কালের চেয়েও কত অগ্রবর্তী ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি যে কেবল বিদেশের উন্নত বিজ্ঞানকে দেশের কল্যানে কাজে লাগাতে চেয়েই শেষ করেছেন এমন নয় তিনি ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য এবং ভারতের প্রাচীন উন্নত সভ্যতার গরিমাময় দিকগুলিকে অস্বীকার করেননি; এমনকি প্রাচীন ভারতবর্ষ কতখানি বিজ্ঞান চেতনায় ঋদ্ধ ছিল সেকথাও অত্যন্ত গর্বের সাথে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা যে গ্রীক ও মিশরীয় সভ্যতার চেয়েও অনেক প্রাচীন ও উন্নত।দিল্লিতে থাকা কুমারগুপ্তের সময়কার লৌহের স্তম্ভ ১৫০০ বছরের পুরানো হলেও তার নির্মাণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন যতই পশ্চিমা দেশগুলি নিজেদের সভ্য ও আধুনিক বলে মনে করে থাকুন আসলে সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার এই আর্যাবর্ত থেকেই শুরু হয়েছিল তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। প্রাবন্ধিক একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকের মতই সেগুলি উল্লেখ করেছেন দেশবাসীর জন্য, যাতে কেউ এই অভিযোগ আনতে না পারেন যে ব্রিটিশ কর্মচারী হবার কারনে তিনি আধুনিক বিদেশী সভ্যতার জয়গান করেছেন এবং বিদেশী

যন্ত্রপাতি এদেশে এনে শিল্পবিকাশের কথা বলেছেন।দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিবিড় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় সভ্যতা সবচেয়ে উন্নত কিন্তু কালের নিয়মে বিগত সেইসব দিন হারিয়ে গেছে যা নিয়ে বড়াই করে কার্যত কোনও লাভ নেই। কারন বর্তমান যুগ শিল্পসভ্যতার যুগ।শিল্পের বিকাশ ভিন্ন কৃষির উন্নতি যেমন সম্ভব নয় তেমনি শিল্পের উন্নতি হলে দেশ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। ফলে দেশের উন্নতি করতে গেলে পশ্চিমা দেশের সাহায্য সহযোগিতা ভীষন দরকার।যে বা যারা অতীত সভ্যতার বড়াই করে দেশের উন্নতিতে নির্লিপ্ত থাকে তাদের প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করেছেন।তিনি মনে করেছিলেন দেশের উন্নতিতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একদিকে দেশের অতীত ঐতিহ্য পরম্পরাকে মনে রাখা অন্যদিকে উন্নত যন্ত্রসভ্যতাকে দেশের কল্যানার্থে ব্যবহার করে দেশেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তিনি রামায়ন মহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন লোককথা প্রবাদ ও গ্রাম্য ছড়ার উল্লেখ করেছেন।এখন জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের জন্য যেরকম অতীত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আধুনিক কালের বিজ্ঞানের যোগসূত্র খোঁজার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে সেই ভাবনার অগ্রদূত হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিবেচিত হতে পারেন।লৌহের উৎস ও ব্যবহার জানাতে গিয়ে তিনি মহাভারতের কর্ণের তথা বিভিন্ন দেবদেবীর অস্ত্রের কথা তুলে ধরেছেন যেগুলি মূলত লৌহ থেকেই নির্মিত হয়েছিল সেগুলি কিভাবে পাওয়া সম্ভব যদি ভারত লৌহের ব্যবহার না জানত; এই প্রশ্নই তিনি করেছেন।অনেক সভ্যতাকে ভারতের সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বলে ইউরোপীও ইতিহাসবিদরা মনে করে থাকলেও তা যে ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে বিন্দুমাত্র পুরানো হতে পারে না সেটি প্রাবন্ধিক দৃঢ় বিশ্বাস করতেন। তিনি আত্মানুসন্ধানে যেমন দেশীয় হিন্দু সভ্যতাকে মজ্জায় রেখেছেন তেমনি আধুনিক মনন ও চিন্তনে আধুনিক সভ্যতার বিকাশে উন্মুখ ছিলেন।ব্রিটিশ সরকারের চাকুরি করেও নিঃশব্দে ভারতীয়দের দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এই অসামান্য প্রয়াস তাঁর প্রবন্ধের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে।একজন সদা হাস্যরসিক গল্পাকার যে এতখানি সমাজসচেতন তথা স্বদেশসচেতন ছিলেল তা বিস্ময়ের এবং ভীষণভাবে শ্রদ্ধার ও অনুকরনযোগ্য।

তাঁর "ইস্পাত" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতেও তিনি ইস্পাত কিভাবে উৎপাদন করতে হয় এবং কতভাবে কি কি ধরনের ইস্পাত তৈরি করা সম্ভব তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।একেবারেই পাঠ্যপুস্তকের মতো করেই তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। বিজ্ঞানের উৎপাদনশীলতার ধারণা, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, প্রাচীন দেশজ পদ্ধতিতে উৎপাদনের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তুলনা এবং সর্বোপরি আমাদের দেশের সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে সাবলীল ও স্পষ্ট ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশের উন্নতি তথা আধুনিকতা নিয়ে দারুণভাবে চিন্তাশীল ছিলেন তাঁর ইস্পাত প্রবন্ধ সেকথার সাক্ষ্য বহন করে। উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন দারুণ ওয়াকিবহাল। ইস্পাত উৎপাদনের বেসেমার পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় কঠিন বিষয়টিকে সহজ ভাবে উপস্থাপন করেছেন।এটি তাঁর প্রবন্ধের এক বৃহৎ গুন। কোনও জটিল বিষয়কে সরল সাবলীল দৈনন্দিন ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে পরিবেশনে তাঁর জুরি মেলা ভার। দেশের মানুষের অনুৎপাদক অসার আত্মম্ভরিতাকে যেমন অকপট ভাবে তিরস্কার করেছেন তেমনি দেশের উন্নতিকল্পে তাঁর স্বচ্ছ ও অতিবাস্তব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ দেশের উন্নতির ভাবনায় ঋদ্ধ ও সমুন্নত। তাঁর প্রতিটি ভাবনা আবর্তিত হয়েছে দেশসেবার নিমিত্ত। তাঁর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। সেইজন্য যখনই তিনি কোনও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার সাথে ভারতের দেশীয় পদ্ধতির তুলনা করে তা কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে

বিষয়ে তাঁর প্রাজ্ঞ অভিমত প্রদান করেছেন। ইস্পাত প্রবন্ধের মধ্য থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে তিনি কতখানি এবিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন।

> ১) "দ্রবীভূত পিগলৌহের সহিত যে লৌহ মিশ্রিত করিয়া বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাকে স্পাইজেলিসন বলে। জার্মানি হইতে ইহা বিলাতে আমদানি হয়। ইহা এক প্রকার ঢালা লৌহ, কাঠের কয়লা দ্বারা প্রস্তুত। ইহাতে শতকরা চারিভাগের অধিক কার্বন থাকে। বিলাতে আমদানি করিবার নিমিত্ত বনবিভাগের নিকটবর্তী স্থানে আমরা এমন লৌহ প্রস্তুত করিতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশে এমন লোক নাই যে ,লৌহকারদিগকে যথানিয়ম শিক্ষা প্রদান করিতে পারে। কি কোথায় হয় তাহা কেহই জানে না, কে কোথায় কি করে তাহাও কেহ জানে না। জানিতেও কেহ যত্ন করে না। তবে কি করিয়া কাজ হইবে ? দেশে কোথায় কি হয়, কি উপায়ে কিসের উন্নতি হতে পারে,এইরূপ জ্ঞান সংগ্রহ ও জ্ঞানবিতরনের নিমিত্ত আমরা একবার একটি সভা সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম ।দেখিলাম গলায় কুঠার বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে না পারিলে কেহই কৃপাকটাক্ষ করিবেন না।"
>
> ২) "আমাদের দেশের বনবিভাগের নিকট যেখানে উৎকৃষ্ট লৌহ- আকর আছে,সেখানে আমাদের সমুদয় কার্যোপযোগী ইস্পাত অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। সে ইস্পাত করিতে ব্যয়ও অধিক পড়ে না। তবে দরিদ্র মূর্খ লৌহকারদিগকে উৎসাহিত করা ও শিক্ষাদান করা নিতান্ত আবশ্যক।"

এই দুটি অংশের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কেবল বিষয়ের অবতারণা করা নয় বরং বিষয়টি অবতারণা করার নেপথ্যে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য সেটি হল দেশের মধ্যেই দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন করে দেশের প্রয়োজন মেটানো।এর জন্য যে আধুনিক যন্ত্রজ্ঞান প্রদানের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট পেশার কারিগরদের যাকে আধুনিক পরিভাষায় Industrial training বা কারিগরি শিক্ষা, যেগুলি ক্যাম্পেনিং এর মাধ্যমে সাধারন পেশাজীবীদের প্রদান করা হয় উন্নততর উৎপাদনের জন্য সেগুলির প্রয়োজন বা তাগিদ অনুভব করেছিলেন সেই যুগে বসেই। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষি থেকে শিল্প এবং গ্রাম উন্নত করার তাগিদে এই ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যাপক ভাবে চলছে।ঊনবিংশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে বসে যে কথা উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রয়োজনীয়তা একালে এসেও মর্মে মর্মে অনুভব করছে প্রত্যেক ভারতবাসী। তিনি জানতেন ব্রিটিশ সরকার কোনও দিনই সেভাবে শিল্পের উন্নতির কথা ভাববে না এদেশের জন্য,সেইকারনেই ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কিছু ক্যাম্পেনিং করেছিলেন যাতে দেশের মানুষের সম্বিৎ চেতনা ফিরে আসে জানতে পারে আধুনিকপদ্ধতির কথা কিন্তু ন্যুজপ্রায় দরিদ্র দেশবাসীকে তিনি বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। এই খেদ তাঁর ছিল।তবুও তিনি মনে করতেন একমাত্র সরকারিভাবে দেশের মূর্খ দরিদ্র উক্ত পেশাজীবি মানুষদের উপযুক্ত ক্যাম্পেনিং এর অত্যন্ত দরকার।কম খরচে ভালো মানের ইস্পাত তৈরি করার জন্য এগুলি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ একদিকে নতুন পদ্ধতিকে কাজে লাগানো এবং সাথে সাথে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রমিকদের নিবিড়ভাবে ওয়াকিবহাল করানো ও যন্ত্রব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে উন্নত মানব শ্রম তৈরি করে এগিয়ে যেতে হবে তবেই দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পারে দেশের মানুষ সহজেই স্বনির্ভর হতে পারবে। কালের চেয়েও অগ্রবর্তী ছিল তাঁর এই চিন্তন। তিনি যে দেশ সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন তা এগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। আমরা যদি একটা ছকের সাহায্যে তাঁর ভাবনার মুল

কথাগুলো দেখাই তাহলেই বোঝা যাবে তিনি ব্যবসা বানিজ্য এবং উৎপাদন নিয়ে কতখানি বাস্তব ও আধুনিক ছিলেন। বর্তমানের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই।

উৎপাদন =

কাঁচামাল + আধুনিক যন্ত্রপাতির ও প্রযুক্তির প্রয়োগ+ মূলধন + প্রশিক্ষিত মানবশ্রম

দেশীয় কাঁচামাল +বিদেশের যন্ত্রপাতি+দেশের মূলধন + দেশের প্রশিক্ষিত কর্মী

অর্থাৎ কেবলমাত্র বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী করে সেই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করতে পারলে তা হবে সবচেয়ে সাশ্রয়ী। প্রাবন্ধিকের এই চিন্তন আধুনিক উৎপাদন শিল্পের বীজমন্ত্রের ন্যায়। যেকোন শিল্পের এই নীতি মেনে উন্নতি করা সম্ভব। আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল ও ব্যবস্থাপনা ,কারবার সংগঠন তত্ত্বেও এটি উন্নীত হয়েছে। সুরাং প্রাবন্ধিকের চিন্তা চেতনা যে সম্পূর্ণ আধুনিক ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

আসলে তিনি হাস্যরসিক হলে কি হবে তাঁর মধ্যে ছিল এক গভীর দেশপ্রেম এবং প্রশিক্ষিত মানসিকতা। যা তাকে এক স্বতন্ত্র লেখকে পরিনত করেছে। তিনি সমকালের কোনও লেখককেই অনুসরণ তো করেননি এমনকি গতানুগতিক নেখায় নিজেকে নিমজ্জিত করেননি। সেই কারনেই তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসের আবেদনও ভিন্ন এবং অসঙ্গতির সূত্রে হাস্যরসের নির্মাণে মৌলিক ও একক।তেমনি যখন তিনি প্রাবন্ধিক তখন তিনি কোনও গতানুগতিক বিষয়ের অবতারণা না করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনের কথা ভেবেছেন। অকপটে তিনি তার প্রবন্ধের মধ্যে সেকথা স্বীকারও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যে লোকশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। প্রাবন্ধিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লোকশিক্ষা নয় প্রশিক্ষিত করার কথা ভেবেছিলেন। কারন তিনি জানতেন পরাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র। উৎপাদনে ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে এবং তার ফলেই দেশে অভাব আর দারিদ্র্য বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হওয়া। যার একমাত্র নিদান এদেশে উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি করা। প্রাবন্ধিক তাঁর বিদগ্ধ চেতনায় বিহঙ্গ অবলোকনে দেখেছেন দেশের দূরবস্থা। তা থেকে উদ্ধারের উপায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় তথ্যের দারুন ও পর্যাপ্ত সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পাঠক তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করার পর যেন বক্ষ্যমান জ্ঞানার্জন করতে পারে সম্যক পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই। একদিকে তিনি শিক্ষক প্রায় অন্যদিকে সংস্কারক এই দ্বৈত সত্ত্বাই তাঁর প্রবন্ধগুলিকে ভিন্নতর স্বাদুতা দান করেছে।

তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ “বিড়াল” নানা দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিড়াল প্রবন্ধটি অবশ্য এর আগেই ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দুইজন দুই মেরুর প্রাবন্ধিকের একই শিরনামে প্রবন্ধ রচনা করলেও দুটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল প্রবন্ধটি সামাজিক তত্ত্বের অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে গভীর তত্ত্ব কথার জালে আবদ্ধ। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের বিড়াল প্রবন্ধ কতকটা ছাত্রপাঠ্য রচনার ন্যায়। যদিও বঙ্কিমের মতোই এটিও লঘু মেজাজে রচিত হাস্যরসে পূর্ণ একটি রচনা তথাপি বিড়াল রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে লোকশিক্ষাদানের বিষয়টি অন্তরালে রেখেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ সেভাবে না করেই একেবারে সহজ সরল ভাষায় সাধারন পাঠকের জ্ঞানার্জনের জন্য লিখেছেন। এইকারনেই তাঁর বিড়াল প্রবন্ধে বিড়ালের বিভিন্ন স্বভাব চরিত্র, বিড়াল এর লোকশ্রুতি,জনমানসে তার প্রভাব, বিড়াল হতে কিভাবে রক্ষা করা যায় নিজেকে এসবই

প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। জীবনবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান একত্রে মিলিয়ে তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। আধুনিক জীববিজ্ঞানে যাকে এথোলোজি চর্চা বলে প্রাবন্ধিক বিড়াল প্রবন্ধে সেই বিদ্যারই প্রকাশ করেছেন।

প্রাবন্ধিক মনে করেন ভারতীয়রাই প্রথম বিড়াল পুষেছিল।বিলেতে বিড়ালের কদর থাকলেও তারা বিড়াল পুষতে জানত না। মূলতঃ বিড়াল বিলেতে পাওয়াই যেত না। অনেক পরে এদেশ থেকে বিড়াল নিয়ে গিয়ে বিদেশীরা বিড়াল পুষতে আরম্ভ করেছিল। হিন্দু শাস্ত্রে বিড়াল হল মা ষষ্ঠীর বাহন।সেকারনে বিড়াল নিধনে নিষেধাজ্ঞা আছে ভারতীয় সমাজে। প্রাবন্ধিক মনে করেন ইংরেজিতে বিড়ালকে যে পুশি বলা হয় তা এদেশের তামিল ভাষা থেকেই আগত। কেননা তামিল ভাষায় বিড়ালকে 'পুষে' নামে ডাকা হয়। হয়তো এই পুষে থেকেই পুশি এসেছে।গবেষকের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন কেবল বিলিতি ভাষায় নয় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতেই বিড়ালের নাম এসেছে এই ভারতীয় নাম থেকেই। শুধু বিড়াল কেন মোরগ বা কুক্কুট শব্দটিও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গিয়ে কাছাকাছি কোনও নাম গ্রহন করেছে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন ভারতের বহু শব্দই বিদেশে গিয়েছে এবং এইসব নামকরণ আসলে ভারতীয়দের দেওয়া। অন্যান্য প্রবন্ধের মতোই এই প্রবন্ধেও ভারতবর্ষের গৌরবের কিছু দিক একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ন্যায় তুলে ধরেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ অনেকগুলি ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। বর্তমানে যাকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা বলে সেই চর্চা তিনি করে থাকতে পারেন কেননা তিনি যেভাবে একটি শব্দকে বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন তাতে বহুভাষার শব্দভাণ্ডার তাঁর জানা ছিল বলেই মনে হয়। প্রথাগত শিক্ষায় তিনি বেশিদূর শিক্ষিত হতে পারেননি ঠিকই কিন্তু শিক্ষার তীব্র আগ্রহ তাঁর আজীবন ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই তিনি বিলেতে থাকাকালীন বহুগ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ফলে ভাষাগত বিষয়গুলি তিনি যেমন অবগত ছিলেন তেমনই শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস ভূগোল সবই আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। বিড়াল তেমনই একটি প্রবন্ধ যেখানে উৎস থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই আছে। বিড়াল নিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত উপকথাকে তিনি এই প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন। বিড়াল কেন কিভাবে উপকথার উৎস হয়ে উঠেছে তা তিনি উৎসে গিয়ে আবিষ্কার করার দুরূহ সাধনা করেছেন। তিনি কেবলমাত্র মনগড়া কথা বলে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করেননি। বহু অজ্ঞাত শিক্ষণীয় বিষয়কে তিনি সাধারন পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন, পাঠকের অনুসন্ধিৎসু মনকে বিকশিত করতে চেয়েছেন। যেমন –

১) "পূর্বকালে বিলাতে কিন্তু বিড়ালের বড়ই অভাব ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্বদেশ হইতে বিলাতে প্রথম বিড়াল গিয়াছিল। তামিল ভাষায় বিড়ালের নাম 'পুষে'। পস্টু ভাষায় ইহাকে 'পুষা' বলে, পারস্যে 'পুষী'। সকলে মনে করেন ব্রিটেন দ্বীপে যে সমুদয় প্রাচীন ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাতে বিড়ালের কোনো নাম ছিল না। এই তামিল-নামই তাহাতে গৃহীত হইয়াছিল। সে জন্য আইরিশ ভাষায় ইহাকে 'পুস' আরস ভাষায় 'পুষগ' ও গেলিক ভাষায় 'পুইস' ব্লে। বিড়াল রাগিলে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বলিয়াও তাহার এইরূপ নাম হইতে পারে। কারণ যে জন্তু যেরূপ ডাকে তাহার সেইরূপ নাম দেওয়ার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। কাক, কোকিল, বউ কথা কও প্রভৃতি পক্ষীর নাম এই নিয়ম অনুসারেই হইয়াছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সেই সকল নামের এত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক কুক্কুটের নাম দেখ ইংরাজিতে 'কক', ওরুবা ভাষায় 'কোকলো', ইবো ভাষায় 'ওকোকো', জুলু ভাষায় 'কুকু', ফিনিশ ভাষায় 'কক্কো' ইত্যাদি। প্রাচীন পারস্যবাসীরা কুক্কুটের বিশেষ সম্মান করিতেন। কারন সকালবেলা ডাকিয়া ইহারা লোককে জাগাইয়া দেয়; মানুষে দিবসের ধর্মকর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ পক্ষীকে ডাকের মতো নাম দিলে তাহার অপমান হয় । তাই প্রসিদ্ধ

জেন্ড আবেস্তা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে –"The bird Who bears the name of Paradaos O holy Zarthustra:upon whom evil-speaking men impose the name Kaharkatak. (কুক্কুট)"।

২) "আমাদের কসের দাঁত দিয়া যেমন আমরা খাদ্যকে পিষিয়া ফেলি, ইহাদের কসের দাঁত সেরূপ পিষিবার উপযোগী নয়। বাইকসপিড-দন্তের ন্যায় কসের দাঁত দিয়া ইহারা কেবল খাদ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারে। তাহারপর না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। তবেই হইল, বিড়ালজাতীয় জন্তুদিগের সচরাচর ২৮টি করিয়া দন্ত থাকে- অর্থাৎ ১২ টি ইনসাইসার, ৪টি কেনাইন, ৮ টি বাইকসপিড ও ৪ টি মোলার। কোনো কোনো জাতিতে ৩০ টি করিয়া দন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। হাড়ের গায়ে মাংস ও রক্ত লাগিয়া থাকিলে চাটিয়া খাইতে পারিবে বলিয়া বিড়ালের জিহ্বা অতিশয় কর্কশ।"

প্রাবন্ধিক বিড়াল প্রবন্ধটিকে বস্তুগত ও ব্যক্তিগত উভয় ধরণের প্রবন্ধের একটা মিশেল ঘটিয়েছেন।একদিকে তিনি ব্যক্তিগত চিন্তার বিষয়গুলি যেমন হাল্কা চালে তুলে ধরেছেন তেমনই জীব বিজ্ঞান তথা প্রাণবিজ্ঞানের নানান বিষয় তথ্যের আকারে হুবহু তুলে ধরেছেন।ফলে বস্তু নিচয়ের পাশাপাশি প্রাবন্ধিকের হাল্কা ফুরফুরে মেজাজের উপাদান একত্রে মিশে প্রবন্ধটিকে মিশ্র প্রবন্ধ করে তুলেছে। প্রবন্ধের যে প্রকৃষ্ট বন্ধন তা এখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন জ্ঞানবিকাশের জন্য সেটি উত্তীর্ণ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল প্রবন্ধে একই সঙ্গে জ্ঞান, বুদ্ধি, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা একত্রিত হয়েছে সেই গভীরতা এখানে আশা করা যায়না। কারন প্রাবন্ধিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন সাধারন মানুষের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য। নিজেও সেকথা বলেছিলেন-"বিড়ালের অঙ্গ সৌষ্ঠব নিয়ে আমি কিছু বলিতাম না, কারণ সকলেই ইহা চক্ষে দেখিতেছেন।তবে, কোনো বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার রীতি এদেশ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে,তাই এ সম্বন্ধে মোটামুটি দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।"

প্রাবন্ধিক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত কিছু সংস্কারকেও এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। একজন সমাজজ্ঞ প্রাবন্ধিক হিসাবে এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। আধুনিক কালে উপকথা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কার লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যে প্রবেশ করেছে। কারন প্রবাদ বা লোকশ্রুতি কিংবা লোকগল্প গড়ে ওঠার পিছনে থাকে এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট।আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা এর গুরুত্ব অস্বীকার করেননি বরং এই সব প্রচলিত লোককথার পশ্চাতে যে গভীর অনাবিষ্কৃত সত্য লুকিয়ে আছে তা বের করার চেষ্টা করেন। প্রাবন্ধিক বিড়াল প্রবন্ধের মধ্যে কেবল বিড়াল নয় সাপ ভল্লুক ইত্যাদি নিয়েও সংস্কারের কথা বলেছেন।

বিড়াল প্রবন্ধে এক অনাবিল হাস্যরসের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন প্রচলিত বিড়ালের একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একজন হাস্যরসিক এবং তার সমস্ত সাহিত্যকৃতির মধ্যে হাস্যরস একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে থেকে। বিড়াল প্রবন্ধেও সেই হাস্যরসের পরিবেষন করেছেন।কতকটা কমিকস এর ন্যায় কিছু অসংগতি তুলে বিড়ালের অহংকার আর কুকুরের স্থিতধী উত্তর যথার্থ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

> "বিড়ালী পরম সুখে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন, কুকুরের কিন্তু সে আদর নাই, কুকুর ঘরের ভিতর যাইতেও পায় না, সেই দুর্যোগের দিন অনাথা ক্ষুধার্ত কুকুরটি সতৃষ্ণ নয়নে খাবারের জন্য ঘরের দিকে চাহিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল।"

তাই বিড়ালী ঘরের ভিতর হইতে তাহাকে বলিলেন,-

"টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে ভিজে যাচ্ছে গা।
আমি যেন ব'সে আছি মহারাজের মা।।"

কুকুর তখন চুপ করিয়া রহিল। দৈব ক্রমে আমাদের পরম পূজনীয় বিড়ালীটি সেই রাত্রে গৃহস্থের হাঁড়ি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কারণ রক্ত-মাংসের শরীরে ভ্রম সকলকারই হইয়া থাকে। মোহ মুগ্ধ গৃহস্থের তত্ত্বজ্ঞান নাই। সে পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে ধরিয়া বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বিদায় করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কুকুরটি ছাইগাদার উপর বসিয়া আদ্যোপ্রান্ত সমুদয় রহস্য দেখিতেছিল। অবশেষে সে বিড়ালীকে জিজ্ঞাসা করিল –

"কা'ল যে বড় শুনেছিলাম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।
বিচালির দড়ি গলায় দিয়া যাওয়া হচ্ছে কোথা।।"

বিড়ালী উত্তর করিলেন-

"এখন ধর্মে দিয়াছি মন।
তুলসীর মালা গলায় দিয়া যাচ্চি বৃন্দাবন।।
সাধু,সাধু! সংসারের উপর কি বৈরাগ্য!"

অনাবিল হাস্যরসের সৃজন করেছেন এখানে। বিড়াল প্রবন্ধে বিড়াল সম্পর্কে যা সূচনা করেছিলেন একেবারে শেষে এসে তার তেমন কোনও মিল নেই কেবল বিড়াল বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ বিড়াল প্রবন্ধে অহেতুক অনেক বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন যার হয়তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই কারনেই বিড়াল রচনাটি একটি শিথিল বিন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে।প্রবন্ধের শৃঙ্খলা পারম্পর্য এখানে অধরাই থেকেছে।বিড়ালের যে শারীর বৃত্তীয় বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে তা নিসঃন্দেহে বস্তুসূচক কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বস্তুগত ধারণা প্রবেশ করল লোককথায় একেবারে শেষে এসে পরিবেষণ করলেন নির্ভেজাল এক হাস্যরসের আনন্দ। সেইকারনেই এই প্রবন্ধটি না বস্তুগত না ব্যক্তিগত বরং এই দুইয়ের মিশ্ররূপ। আসলে প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর কিছুটা ঘাটতি অবশ্যই ছিল সেকথা মেনে নেওয়াই ভালো। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেও এরূপ দুর্বলতা চোখে পড়ে।তার পরেও তাঁর সরল সাধাসিধে সোজাসাপ্টা বক্তব্য সর্বোপরি হাল্কা মেজাজের হাস্যরসের সমাবেশ এইসকল প্রবন্ধ গুলিকে অনন্যমাত্রা দিয়েছে।

তাঁর 'পশম' প্রবন্ধের বক্তব্যও খুবই সাধারণ একটি বিষয়কে নিয়ে লিখিত। পশম কি কোথায় পাওয়া যায়,কিভাবে উৎপাদন করলে পশমের চাহিদা মেটানো যায় এসবই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।বিভিন্ন প্রদেশে কিভাবে মেষ পালিত হয় এবং সেই মেষ থেকে কিভাবে কতখানি উন্নত পশম পাওয়া সম্ভব তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন আছে এই প্রবন্ধে। একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে পশম উৎপাদিত হত ব্যাপক পরিমাণে কিন্তু সেই পশম ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার মতো তেমন আধুনিক শিল্প ছিল না। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে প্রাপ্ত মেষের পশম দিয়ে আধুনিক পশম শিল্প স্থাপনা করলে তা পশম শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে।তিনি উত্তরভারত এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন এবং সেইসব স্থানে মেষপালনের পদ্ধতি এবং পশম সংগ্রহের বিষয়গুলি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোলের ধারনায় সেইসব প্রলব্ধ জ্ঞান জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় প্রবন্ধে পরিবেষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ ছিল এই প্রবন্ধ সাধারণের তেমন কাজে আসবে না।কারন ভারতের

মেষপালকেরা অজ্ঞ তারা জানেনই না বাইরের দুনিয়ার অগ্রগতির কথা। এমনকি তাদের জানানোর কোন ব্যবস্থা করা হয়না কিংবা প্রশিক্ষিত করা হয় না।এই কারনেই উপযুক্ত পশম চাষ হলেও ভালো পশমের দ্রব্যাদি বিদেশ হতেই অধিক ব্যয়ে ক্রয় করিতে হয়।প্রাবন্ধিক অনুশোচনা করেছেন,তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অরণ্য রোদন মনে করেও যথেষ্ঠ আশাবাদী ছিলেন তিনি।তিনি মনে করতেন বীজ বপন করলে একদিন না একদিন ফল প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটবে।

"ভারতবর্ষের মেষ পালকেরা কিন্তু নিতান্ত মূর্খ। সময়ের পরিবর্তনের কথা তাহারা কিছুই জানে না। ভারতবর্ষে যে পশম উৎপন্ন হয়,তাহা হইতে ৩০লক্ষ টাকার পশম বিদেশে প্রেরিত হয় ,একথা তাহারা কি করিয়া জানিবে? আর অল্প প্রিশ্রম করিলে এখন যে কয়মন পশম ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়, তাহাই ৪৫ লক্ষ্য টাকায় বিক্রীত হইতে পারে, তাহাও তাহারা জানে না।এই সকল বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহা যে অরণ্যে রোদন হইতেছে, তাহা আমি বিলক্ষণ্রূপ জানি।তবে এই মনে করি যে বীজ বপন করিয়া যাই, একদিন না একদিন ফল ফলিবে।"

পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর এইসব প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য অতি সাধারন দরিদ্র মূর্খ দেশীয় পেশাজীবি সমাজের উন্নতির জন্য। সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তর যদি শিক্ষিত আর উন্নত না হয়ে ওঠে তাহলে যে দেশের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয় সেকথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। জানতেন বলেই তিনি লোক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।ব্যাপক ও নিবিড় প্রশিক্ষণ ব্যতীত যে অশিক্ষিত মেষপালকদের উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা যাবে না সেটিও তিনি বুঝেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন এইসব সাধারণ মানুষের কথা ভেবে প্রবন্ধ লিখেছেন বলেই গভীর তত্ত্বকথা তিনি বাদ দিয়েছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবেই। ভালো পশম খারাপ পশম চেনার উপায়, মেষের জন্য উন্নত ঘাস চাষের পদ্ধতি, পশম সংগ্রহের উপায় এসবই তিনি 'মূর্খ মেষপালক' দের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন পাঠ্য বইয়ের মতো করেই। ইচ্ছে করলেই তিনি গুরুগম্ভীর বা সিরিয়াস প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল কিন্তু তিনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো বিশ্বাস করতেন লোকশিক্ষা অথবা জনশিক্ষা আগে দরকার দেশের ব্যাপক ও নিবিড় উন্নতির জন্য। দুজনকেই প্রাগমাটিস্ট বা উপযোগবাদী বলা যেতে পারে। যদিও বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কোনও দিকদিয়েই তুলনা করা যাবে না। বিদ্যাসাগরের উন্নত মেধা মনন চিন্তন জ্ঞানমার্গের গগনচুম্বী প্রতিভাকে কারও পক্ষেই স্পর্শ করা সম্ভব নয়।কেবল একটি মানসিকতাকেই মেলানো যায়- দুজনেই চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার। বিদ্যাসাগর মহাশয় সার্বিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।তিনি মনে করতেন উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষায় তথা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষিত হলে যে যেই পেশায় আছে তার উন্নতি সম্ভব হবে। এর জন্য পেশা পরিবর্তনের দরকার নেই। কারন রেশম থেকে পশম সব চাষই নির্ভর করে ভৌগোলিক অঞ্চল এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর। জলবায়ু পরিবর্তন করা অসম্ভব কারন এটি প্রাকৃতিক বিষয়,তথাপি যদি মেষপালকদের প্রশিক্ষিত ও সমসাময়িক করে গড়ে তোলা যায় তাতেই উৎপাদনে অনেক উন্নতি ঘটবে ভারতের দরিদ্র মেষপালকেরা আর্থিক ভাবেও উন্নত হবে। তার এই ধারনা সমসাময়িক কালের চেয়েও আধুনিক তথা চিরন্তন বলা যেতে পারে। কিছু কিছু নতুন তথ্য এই প্রবন্ধে দিয়েছেন এবং কবি সাদীর কবিতাংশ উল্লেখ করেছেন এই প্রবন্ধে। যে সব তথ্য সাধারণত কোনও পুস্তকে বর্ণিত হয়নি তেমন কিছু বিকট তথ্য তিনি আমদানী করেছেন এই প্রবন্ধে।যা অপ্রয়োজন ছিল।এই সকল তথ্য যথেষ্ঠ উদ্দীপনাময় ও কিঞ্চিত হাসির বটে তবে তা মূল বক্তব্যকে বারেবারেই চাপা দিয়ে দিয়েছে। মেদবহুওল হয়েছে

আলোচনা।মূল প্রসঙ্গ বারেবারেই হারিয়ে গেছে মেদ বাহুল্যের চাপে। এজন্যই প্রবন্ধটির যথার্থ বন্ধন হারিয়ে গিয়ে কিছু তথ্য ও বক্তব্যের সমাবেশে পরিনত হয়েছে। আসলে তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ প্রবন্ধের মধ্যে সুযোগ পেলেই কোননা কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় খুঁজে বেড়ানো এতে কিছু কিছু স্থানে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক হয়।পাঠক এইসব আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেন কেননা এইসকল অবান্তর ও অবাঞ্ছিত আলোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবন্ধগুলিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে বক্তব্য বিষয়কে। ফলে সার্থক প্রবন্ধ হবার যথেষ্ঠ অবকাশ থাকলেও প্রাবন্ধিক তা করে উঠতে পারেননি।যুক্তি পারম্পর্যহীন ভাবে অনেক সময়ই বিভিন্ন কবিতা বা লোককথার উদাহরণ টেনেছেন যা মূল বিষয়ের একেবারে বাহিরে।ফলে যে বক্তব্য মাত্র কয়েকটি বাক্যে বলা সম্ভব হত তাকে তিনি অহেতুক টেনে বাড়িয়েছেন এবং একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন বহুস্থলে।প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর এই দুর্বল স্থানগুলি চিহ্নিত করা দরকার। তবে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য বিষয় চয়ন,বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের ঋদ্ধতা অবিসংবাদিত ভাবেই সুযোগ্য ও সুরম্য। ভারতের উন্নতিকল্পে তার চিন্তা চেতনা চিরকালের পাথেয়।

তাঁর অপর একটি সার্থক প্রবন্ধ ‘এরণ্ড বা রেড়ি’ আর পাঁচটি প্রবন্ধের মতোই গতানুগতিক ও তাঁর উদ্দ্যেশ্যের সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধেও তিনি রেড়ির চাষ ও তৈল উৎপাদনের বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এদেশের চাষিদের উন্নতির জন্য লিখেছেন।প্রবন্ধটি অন্য প্রবন্ধগুলি থেকে একটু ভিন্ন প্যাটার্নের।প্রবন্ধটি কয়েকটি উপশিরোনামে বিষয়বস্তু গুলিকে ভাগ করে আলোচনা করেছেন ঠিক যেমনটি উচ্চশ্রেণির ছাত্রদের প্রবন্ধ রচনায় দেখা যায়। উপশিরোনামগুলি হল সূচনা, নাম, নিবাস, জাতি, মোকাম, চাষ, তেল, ব্যবসা, খোল ও রেশম, শেষ। একমাত্র এই প্রবন্ধটিতে তিনি অতিকথন করেননি সরাসরি বিষয়বিন্যাসে গিয়ে মূলকথাগুলি যথাযথভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। ফলে আগের প্রবন্ধগুলির মতো এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় থেকে ফোকাস সরে অন্যদিকে যায়নি। যথার্থ বস্তুগত প্রবন্ধের সকল বৈশিষ্ট্য এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষকের নিবিড় মনন এবং চিন্তন এই প্রবন্ধের সিরিয়াসনেস অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে। রেড়ির নামকরন কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে বিস্তর তথ্য সামনে এনেছেন তিনি।কেবল সংস্কৃত পুস্তকাদি থেকে নয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পুস্তকের পাঠপূর্বক তিনি এই নামকরণের একেবারে আদিমূলে পৌঁছুতে চেয়েছেন। এতে তাঁর পড়াশুনার চর্চা ও জ্ঞানের গভীরতা যেমন ঈর্ষনীয় করে তুলেছে তেমনি তথ্যের প্রাচুর্য পাঠকের জানার আগ্রহ ও জ্ঞান চর্চার বিকাশে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে তা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃত দুষ্প্রাপ্য রাজনির্ঘণ্ট অভিধান থেকেও রেড়ির প্রতিশব্দগুলি উল্লেখ করেছেন।আধুনিক ভারতীয় ভাষায় কিভাবে রেড়ি নামটি এসেছে সেটিও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এড়ণ্ড থেকেই রেড়ি শব্দটি এসেছে। যদিও বাংলা ভাষায় রেড়ির আসল নাম ভেরেণ্ডা। তিনি যে বহুভাষার শব্দ নিয়ে চর্চা করতেন তা তাঁর সব প্রবন্ধেই দেখতে পাওয়া যায়। একটি নাম তিনি একাধিক ভাষায় কি বলা হয় তার উল্লেখ করেছেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিতের মতোই। যেমন –

নাম: এড়ণ্ড বা রেড়ি ভাষার নাম যে নামে বলা হয়

১। সংস্কৃত, ব্রাঘ্রপুচ্ছ, গন্ধর্ব হস্ত, উরুবুক, ব্যড়ম্বক,বুক,অমণ্ড,আমণ্ড,ব্যরন্দন,কান্ত,ক্রণ,শুক্ল,বাতারি ও দীর্ঘপত্রক, রুবু চিত্রক চঞ্চু,পঞ্চাঙ্গুল ,মণ্ড, বর্ধমান।

২। বাংলা ভেরেণ্ডা।

৩। হিন্দি অরণ্ড,রণ্ড

৪। সাঁওতালি এড়ড
৫। আসামী এড়ি
৬। নেপালী অরেটা
৭। লেপচা রকলোপ
৮। মগধী্ রেড,লেড়,অণ্ড
৯। ওড়িয়া গাব গোণ্ড,মেরিণ্ডা
১০। মারহাটি এরেণ্ডি
১১। তেলেগু এরামুডপু
১২। তামিল অমনক্কম ,কোটিমুটু
১৩। কর্ণটি হরালু
১৪। ব্রহ্ম কেশু
১৫। সিঙ্ঘলী এণ্ডারু
১৬। চীন পীমা
১৭। পুস্ত অরহণ্ড
১৮। আরব্য খিরওয়া
১৯। পারস্যব সাঞ্জির বেদাঞ্জির

এই একটি জিনিসকে বলতে এতগুলি ভাষায় নাম ব্যবহারের মধ্যে জ্ঞানের আতিশয্য থাকলেও পাঠকের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কারন প্রবন্ধ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র নয়। পাঠক মূল বক্তব্য থেকে অনিচ্ছকৃত হলেও দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।এইকারনেই বোধহয় হাল্কা চালের হাস্যরসের গল্প রচনায় তার সিদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও প্রবন্ধগুলি নিয়ে পাঠকের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হয়।এত তথ্যের সমাবেশের প্রয়োজন না থাকলেও তথ্যের পর তথ্য দিয়ে প্রবন্ধগুলিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। তিনি রেড়ির নাম কিভাবে হল এটা বলতে গিয়ে রেড়ির গাছে যে পোকা ধরে সেই পোকার নাম কিভাবে এ'ল তার গবেষনাও করেছেন তিনি। এরপর কিভাবে কোথায় রেড়ির গাছের জন্ম হয়েছিল তাঁর নানান সম্ভাব্য বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ডিকান্ডোল সাহেবের 'Origin of Cultivated Plants' বইটির উল্লেখ করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে রেড়ির জাতি, তার চাষ, মোকাম ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন।তিনি সবার আগে যে দেশ ও জাতির উন্নতির কথা ভাবতেন তার প্রমান এই প্রবন্ধের শেষেও দেখা গেছে। বাঙ্গালি বণিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকল্পন করে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেছেন।

> "মনে করিলে বোধহয় এই বিদেশীয় ব্যবসার অধিকাংশ আমরা হস্তগত করিতে পারি। তবে সকল বিষয়ে তত্ত্বসংগ্রহ, জ্ঞানসংগ্রহ, এই হইতেছে প্রথম কথা। কোথায় কোন দেশে কি হইতেছে, কে কি করিতেছে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়াঙ্গম করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাতে আমাদের লাভ হয়, সেইরূপ বিদেশীয় জ্ঞান, চাহিয়া পাই, চুরি করিয়া পাই, ছলে পাই, কৌশলে পাই, আমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল বিদেশীয়েরা সে সব সমুদয় লইয়াছে। তাই তাহারা আজ বড়। আমাদিগের প্রাচীন বিদ্যার উপর এক্ষণে তাহারা যে অসীম উন্নতি সম্পাদন করিয়াছে,সেই উন্নতিটুকু এক্ষণে আমাদিগকে লইওতে হইবে। ফল্কথা, নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া

আমাদিগকে এখন সকল বিষয়ে কারয্য করিতে হইবে। বাঙ্গালীদের মতো প্রখর বুদ্ধি বোধহয় পৃথিবীর কোনও জাতির নাই। তবে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে এ বুদ্ধি অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় হইবে। বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধশালী গৌরবান্বিত এ কামনা করিয়া থাকেন, তিনি প্রার্থনা করুন যেন বাঙ্গালী কৃত নানা দ্রব্য প্রিথিবীর সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"

"পৃথিবীর সকল স্থানেই যেন বণিক বাঙ্গালীর উপনিবেশ হয়। পৃথিবীর সাগর মহাসাগরে যেন বনিক বাঙ্গালীর জাহাজ গমনাগমন করে।হাসিবার কথা ইহাতে কিছু নাই। কেন, আমরা কি মানুষ নই? বুদ্ধিবলে আজ পর্যন্ত আমাদিগকে কে পরাজয় করিয়াছে?বরং যেটুকু সুবিধা পাইয়াছি,সেইটুকুতেই আমরাই সকলকে পরাজয় করিয়াছি। এরূপ মহাউদ্দেশ্য আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ আমরা যতটুকু পারি ততটুকু আগে যাই। আমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের নিমিত্ত যতটুকু পারি, পথ পরিষ্কার করিয়া রাখি।বিদ্যা, বুদ্ধি,ধন, গৌরব হারাইয়া আমাদের পুত্র, পৌত্রগন যেন কোল সাঁওতালদের মতো না হইয়া যায়।"

প্রাবন্ধিক যে বাঙালির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কতখানি আবেগপ্রবণ এবং আশাবাদী ছিলেন এই বক্তব্য গুলিতেই স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অতি সাধারণ জনজীবনে ব্যবহারের সামগ্রী নিয়ে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।যাতে দেশের মানুষের উন্নতি হয় দেশের মানুষ যাতে স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠে তার জন্য তিনি আপ্রান চেষ্টা করতেন কারন তিনি নিজেও দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। কর্ম জীবনে অনুভব করেছিলেন বাঙালি তথা ভারতীয়রা কিভাবে নিরত নিষ্পেষিত হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির চাপে। ক্রমশ: হারিয়ে যাওয়া জাতির উদ্ধারের একমাত্র পথ হিসাবে আর্থ সামাজিক উন্নতির পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন তিনি। তিনি সঠিকভাবেই ভেবেছিলেন দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে উন্নত মানব সম্পদের সাহায্যে কাজে লাগালে তা নিশ্চয়ই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে দেবে।যতক্ষণ পর্যন্ত পরাধীন দেশবাসী জ্ঞানের চর্চা করে আধুনিক বিজ্ঞান ও সমসাময়িক চাহিদার বিষয়কে আলিঙ্গন করতে না পারবে ততক্ষন দেশের সাধারন মানুষের উন্নতি অসম্ভব। উৎপাদন শিল্পের প্রতি নিবিড় জ্ঞান ও আগ্রহ এবং অগ্রগামীতাই দিতে পারে সেই অগ্রগতি। আধুনিক অর্থ শাস্ত্রে যে অণু অর্থনীতির কথা বলে যা প্রত্যন্ত গ্রামের প্রত্যন্ত পরিবার থেকে শুরু হয় এবং যা গ্রাম উন্নতির সহায় হয়ে দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তার পূর্বাভাষ এবং সক্ষম প্রতিফলন যেন অনুরণিত হয়েছে প্রাবন্ধিকের কথায়। মহাত্মা গান্ধী থেকে রবীন্দ্রনাথ সকল মনীষীই চাইতেন গ্রামের প্রত্যন্ত চিরাচরিত পেশার মানুষের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন। কারন ভারতবর্ষ মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের অর্থনীতি শক্ত হলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।শহরে শিল্প স্থাপন করলেও পশম ভেড়েণ্ডা ইত্যাদি যেন গ্রামের মানুষের থেকে সঠিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয় সেদিকে নজর দেবার কথাও বলেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক অর্থনীতিবিদ ছিলেন না অথবা শিল্পপতিও ছিলেন না তবে তিনি বিদগ্ধ জ্ঞানে ঋদ্ধ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের অন্বেষা কেবল নয় বরং বাস্তব জীবনের প্রত্যহিকতার সীমালগ্ন। সমস্যা ও সমাধানের যথাযোগ্য ভাবনার সহাবস্থান ঘটেছে এইসব প্রবন্ধে। একজন দায়িত্বশীল পিতার মতোই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভবিষ্যত প্রজন্মের সন্তানসন্ততি যেন শিল্পের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে বাঙালি জাতির উন্নতি লুকিয়ে আছে। তার এই চিন্তন সত্যিই শ্রদ্ধার ও নিত্যস্মরণীয়। ন্যূজদেহ অলস পরাজিত বাঙালির উন্নয়নের নান্দীপাঠ তিনি রচনা করেছেন।

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল 'গজদন্ত' 'পাথুরে কয়লা' 'গ্যাস' 'গুটিকয় ধাতু', 'বায়ু' 'সুগন্ধ'এড়ী রেশম প্রভৃতি। প্রতিটি প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক পুরাতন কথাগুলিকেই বলার চেষ্টা করেছেন তবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলাদা হবার কারণে প্রতিটি প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট তথা বিষয়ের বিন্যাস একটু আলাদা। গজদন্ত প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের কথা থেকে অতি আধুনিক যুগে পেট্রোলিয়াম গ্যাস পর্যন্ত তিনি আলোচনায় এনেছেন, দেখিয়েছেন সমস্ত ব্যবসাই বাঙালিকে দিয়ে হওয়া সম্ভব। বাঙালি জাতি ইচ্ছে করলেই স্বনির্ভর হতে পারে। তবে তিনি মনে করতেন পুঁথিগত শিক্ষা থাকলেই যে সবসময় সকল বিষয় বুঝতে পারেন তা কিন্তু একেবারেই নয়। তিনি মানসিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। অনেক সময় অল্পশিক্ষিত বা মূর্খ মানুষ যা ভাবনাচিন্তা করেন অথবা বুঝতে পারে অতিশিক্ষিত ব্যক্তিও তা বুঝতে পারেনা। এই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রসঙ্গ এনেছেন গ্যাস প্রবন্ধে। যদিও তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গে ভরা সেই উল্লেখ।

> "সম্প্রতি রাসায়নিক-শাস্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হিয়াছে যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বয়ং ইশ্বর ছিলেন। না হয়, নিদেনপক্ষে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। দশ অবতার তো ফুরাইয়া গেল। অবতারগিরি আর খালি নাই।এখন কল্কিদেব যে কি করিবেন, সেই ভাবনা।তাই! তো!"

অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেবের অবতারত্ব নিয়ে তিনি যে চূড়ান্ত অবিশ্বাসী ছিলেন তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্যাস প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে এই উল্লেখের কি সম্পর্ক তা বলা অসম্ভব কেননা এর দ্বারা তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সাথে প্রবন্ধের মূল বিষয়ের কোনো যোগ নাই।এই ধরনের অবাঞ্ছিত উদাহরণ দেওয়া অবশ্য এখানেই প্রথম নয় তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এক বক্তব্যের উদাহরন দিচ্ছেন এমন কিছু বক্তব্য দিয়ে যার সাথে পূর্বের বক্তব্যের দূরাগত কোনো সম্বন্ধ নেই। তবে তর্কের খাতিরে এগুলি মূল রচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা যায়। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন গ্যাসের যে ব্যবহার হতে পারে একথা অতি শিক্ষিত লোকেরাও বিশ্বাস করেননি অথচ এরাই আবার রামকৃষ্ণের মতো অশিক্ষিত মানুষকে অবতার বানিয়ে দিতে পারে অর্থাৎ কিয়দংশ শিক্ষিত অবুঝ মানুষের সংকীর্ণতা বোঝাতেই এই ধরনের আগাপাশতলাহীন উদাহরণ এনে হাজির করেছেন,যা একপ্রকারের হাস্যরসেরই সৃষ্টি করেছে।

আরও একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে তা হল লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা।তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে যদিও তিনি নিজে অনেক প্রবন্ধকে গল্প হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন সে জানতে বা অজান্তেই হোক বেশ কিছু দেশী বিদেশী লোকগল্প, প্রবাদ, ছড়ার কিয়দংশ তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। এর প্রাবন্ধ উপযোগিতা কতখানি তা নিয়ে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে কিন্তু এইসব প্রবন্ধের মধ্যে লোকসাহিত্যের যে কিঞ্চিৎ সমাবেশ দেখা যায় তাতে সে বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুরাগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিড়াল থেকে রেড়ি সকল প্রবন্ধেই কিছু কিছু লোকসাহিত্য খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি বিলেতে বিড়াল মারার লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। এরূপ ঘটনা হইলে রোমক খৃষ্টীয় ধর্মমতে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করিলে আরো কোনো ভয় থাকে না। করিতে হয় কি, চারিটি বাতি জ্বালিতে হয়, আর এই মন্ত্রটি পড়িতেহয়;-

> "Ut quibus cumque locis accenase, sive positoe, disedant Principe's tenebrarum ET contremiscant, at fugiant pavidi cum omnibus ministris Suis at habitationibus illis etc"

আবার কখনো পুরুলিয়ার ভাদু দেবতার উদ্দ্যেশ্যে কুমারী মেয়েদের গীত ভাদু গানের উল্লেখ করেছেন।–

"কদম গাছে উঠলে ভাদু কাঁচা কদম ভেঙ্গো না।
পাকলে কদম সবাই খাবে কেউ কিছু তখন বলবে না।"

আসলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন পথিকের ন্যায়। তিনি বহু রাজ্য ও দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন কখনো কর্মসূত্রে কখনো কর্মের অন্বেষণে। দারিদ্রপীড়িত জীবনের দর্পণে নিজেকে যেমন বারবার দেখতে হয়েছে তেমনি দেখেছেন ভারতবাসীর অনুন্নত দারিদ্রপীড়িত ছবি।যে ভারত পরাধীন এবং যে ভারত শিক্ষাদীক্ষাহীন পরনির্ভরশীল অসহায় সেই ভারতের উন্নতির জন্য তিনি স্বততঃ মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর এই কর্মমুখী প্রচেষ্টা সেই যুগের পরিপেক্ষিতে যথেষ্ঠই আধুনিক ও সমকাল পেরিয়ে এই শতাব্দীতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন হিসাবে পরিগণিত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম।তিনি নিজেও 'নূতন কথা' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে তাঁর এই পরিশ্রম কেবলমাত্র স্বদেশের উন্নতির জন্য।–

"সমস্ত দিন অপর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রিকালে এই যে জন্মভূমির জন্য পরিশ্রম করিতেছি, সে কেবল দেশের উপকারের জন্য, বিন্দুমাত্র নিজের জন্য নয়।"

তাই তাঁর লেখা প্রবন্ধ হয়তোবা উন্নত প্রবন্ধের তালিকাবদ্ধ হবার যোগ্যতা অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।অনেক দোষত্রুটি তাঁর প্রবন্ধের বন্ধনকে আলগা করেছে,তবু যে কারনে তিনি এইসকল প্রবন্ধ দেশবাসীর জন্য লিখেছিলেন তা জানার পর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে বিনীত ভাবেই মাথা নত হয়ে যায়।অতিরিক্ত বলার ভাষা কোথাও রুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর দেশপ্রীতি ও দেশের প্রতি এই নি:স্বার্থ কর্তব্যপরায়নতা নিঃসন্দেহে যেকোন ভারতীয়ের পাথেয় হওয়া উচিত।তাঁকে বিনম্র প্রণাম জানাই।

বিঃদ্রঃ এই প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে কোনও গ্রন্থ থেকেই কোনো রেফারেন্স গ্রহণ করা হয়নি। সমস্ত ভাবনাই লেখকের নিজস্ব। যদি কোনো ক্ষেত্রে দূরাগত কোনও মিল থাকে তা কাকতালীয় এবং ভাবনার মিল হিসাবেই ধরতে হবে। লেখাটি অসম্পূর্ণ। এর দ্বিতীয় অংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।